অন্ধকার থেকে আলোয়

শামসুর রাহমান

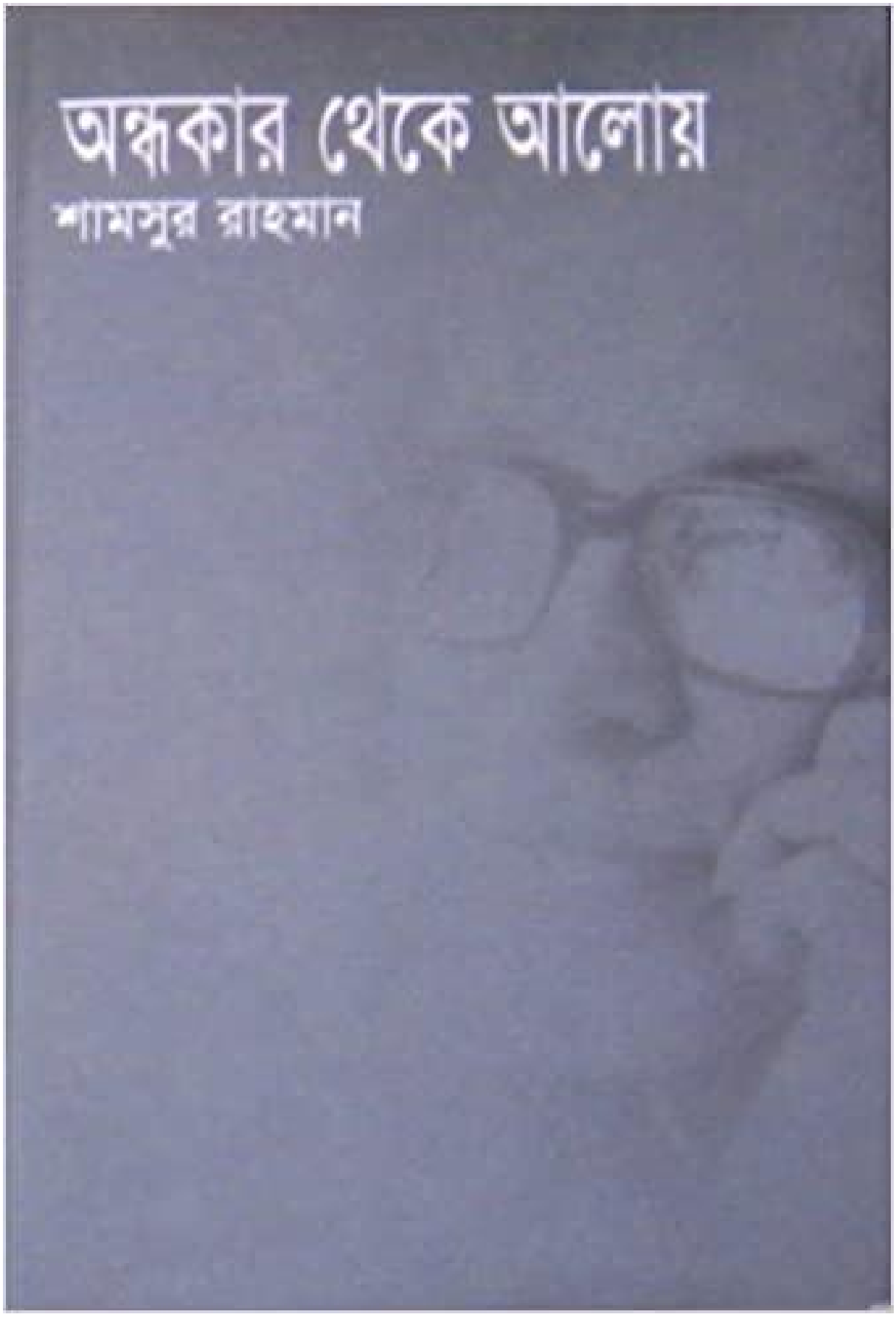

অন্ধকার থেকে আলোয়

শামসুর রাহমান

কাব্যগ্রন্থ(২০০৬)

অজানা পথের ধুলোবালি

কে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে অজানা পথের
ধুলোবালি চোখে-মুখে ছড়িয়ে সন্ধ্যায়?
কেন যাচ্ছি? কী হবে সেখানে
গিয়ে? জানা নেই। মাঝে-মাঝে
বিছানায় শুয়ে সাত-পাঁচ ভেবে চলি। অতীতের
কিছু কথা স্মৃতিপটে ভাসে।
হঠাৎ ভীষণ শব্দ আমাকে কামড়ে ধরে যেন-
ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। অন্ধকার যেন
আরও বেশি গাঢ় হয়ে যায়, এমনকি নিজ হাত
এতটুকু পড়ছে না স্বদৃষ্টিতে। থেকে
যেতে হ'ল আখেরে সেখানে, যে-স্থানের
সবকিছু বেজায় অজানা!
আজকাল প্রায়শই জানাশোনা লোকের মৃত্যুর
খবর বিষণ্ন করে অতিশয় টেলিফোন,
কখনও সংবাদপত্র কিংবা রেডিওর মারফত।
কোনও-কোনও আত্মীয়স্বজন যারা অতি
সাধারণ, নামের জৌলুসহীন, আড়ালেই থাকে।

লক্ষ, কোটি মানুষের মতো।
কখনও কখনও আয়নায় নিজের চেহারা দেখে
সহসা চমকে ওঠে। এই আমি আজ
আমার আপনজনদের মাঝে হেসে, খেলে
থাকি; একদিন আচানক মুছে যাব
ধুলো-তখন সত্তা, পদ্য এবং আপনজন-সবই
শুধু অর্থহীন, হাহাকার!
১৮.১০.২০০৫

অথচ বেলা-অবেলায়

রাতে চাঁদটা হঠাৎ যেন বেজায়
বেঁকে বসল। বলা যেতে পারে, মেজাজ তার হয়তো
অকারণেই বিগড়ে গেছে। হয়তো
এখনই সে ছিটকে মিলিয়ে যাবে জলের ঢেউয়ে।
হঠাৎ আকাশটাকে কেন যেন বেখাপ্পা
ঠেকছে। বস্তুত যেন আকাশকে কেউ ভীষণ
চড় কষিয়ে তার সৌন্দর্যকে নির্দয়ের ধরনে
ধ্বংস করে ফেলেছে। যে-জলাশয় আমার অনেক
সময়কে সাজিয়ে দিয়েছে বিচিত্র সব
চিত্রের আবদানে তার এই বর্তমান চেহারা
কেন জানি আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না।
কোনও মুহূর্তেই। এই জলাশয় ছুঁতে পারছি না কিছুতে।
তবু কেন যেন আমি প্রায়শ এই জলাশয়ের

কাছে চলে যাই কখনও ভোরবেলা, কখনওবা
জ্যোৎস্নারাতে; কখনও কখনও ছুঁই তার করুণ
জলরাশি। কিছুতেই তার আকর্ষণ পুরোপুরি ছুড়তে
পারি না বাতিলের নর্দমায়। এত অপছন্দের পরেও
তার দিকেই তাকাই তাকে এত আকর্ষণীয় কেন যে মনে হয়!
ভাবি কখনও আর যাব না কিছুতেই
সেই বিচ্ছিরি জলাশয়ের কাছে নষ্ট করতে
সময়। কী লাভ ক্ষণে-ক্ষণে বেহায়া ব্যাঙের
লাফ দেখে, পচা জলরাশির দুর্গন্ধ শোঁকা?
প্রতিজ্ঞা করি কখনও এদিকে পা ফেলব না কিছুতে,
অথচ বেলা অবেলায় চ'লে আসি; শুনি বাঁকা হাসি!
০৫.১২.২০০৫

অন্ধকার থেকে আলোয়

মধ্যরাতে কোনার ছোট ঘরে টেবিল-ল্যাম্প
জ্বলতেই আমার কলম বিরক্তিতে
বেজায় খুসখুস করতে লাগল
ডান হাতের তিন আঙুলের চাপে।
কলমটিকে যত রাখতে চাই টেবিলে
ততই যেন ওর জেদ চেপে যায়, সরে না
কিছুতেই। কে যেন জেদ ধরেছে
শূন্য পাতাটি ভ'রে তুলবেই অক্ষরে।
যতই কলমটিকে লুকিয়ে রাখতে চাই চোখের
আড়ালে টেবিলের ড্রয়ারে, কিছু

বইপত্রের নিচে কবর দিয়ে তত বেশি লাফিয়ে
ওঠে সে আমার হাতে। মুচকি হাসে যেন বেজায়
পেয়েছে মজা। কলমের কাণ্ড দেখে হাসব
নাকি কাঁদব ঠিক করা মুশকিল ভীষণ। মনে হল,
অদূরে গাছের ডালে এক হল্‌দে পাখি আমার
দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে কৌতুকী হাসি।
পাখিটি কি ভাবছে ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া লোকটা
জীবনের প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছে ভীষণ
হাবুডুবু খাচ্ছে? গাছতলায় এসে গলায়
দেবে কি দড়ি? কে জানে? আবার আনন্দের
কত মেলা বসে নানা দিকে-আলোর ফোয়ারা ফোটে।
এই তো আরও আচানক দিগ্বিদিক যুবক, যুবতী
জ্বলজ্বলে নিশান কাঁধে নিয়ে হতাশার তিমির
তাড়িয়ে বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধার মুখে ফোটায় হাসি।
২০.১০.২০০৫

অপরূপ চিরন্তন ঘ্রাণ

খাতার প্রথম পাতা পুরো নয়, শুধু
দুই তিন পঙ্‌ক্তি দিয়ে সাজিয়ে হঠাৎ
থেমে যাই। নিজেকে বেজায় খুঁড়ে স্রেফ
থেমে থাকি। কিছুতেই কোনও শব্দ উঁকি
দেয় না অস্থির মনে। কখন অজ্ঞাতে
হঠাৎ মাথায় দুই তিনটি চুল ছিঁড়ে ফেলি-
বস্তুত পাইনি টের। টেবিলে কলম রেখে ধীরে

মাথাটা চেয়ারে রাখতেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে।
চোখ খুলতেই দেখি আলোকিত ঘর আর অদূরে প্রবীণ
একজন রয়েছেন ব'সে-গায়ে তাঁর
হলুদ রঙের আলখাল্লা আর জ্যোৎস্না-রং চুল-দাড়ি
উপস্থিতি তাঁর সাধারণ ঘরটিকে এক
লহমায় স্বর্গের মর্যাদা করে দান। আমি দ্রুত
দাঁড়িয়ে চরণে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রমাণ করি নিবেদন।
জানি না হাতের ছোঁয়া তাঁর পেয়েছিল কি না,
মাথাটা আমার। পরমুহূর্তেই দেখি
আমার আঁধার ঘরে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক
উপস্থিতি নেই, শুধু রয়ে গেছে অপরূপ চিরন্তন ঘ্রাণ।
০২.০৮.২০০৫

আকাশ এমন দ্রুত কেন কালো

আকাশ এমন দ্রুত কেন কালো হয়ে
গ্রাম আর শহরের অধিবাসীদের
ভীষণ কাঁপিয়ে দিচ্ছে? দৃষ্টি জুড়ে
কী দেখছে তারা আকাশের কালিমায়? ঝাঁক ঝাঁক
ঢের কালো দীর্ঘদেহী শকুন উড়ছে কাঁটাময়
অনাহারে হিংস্র ওষ্ঠ নিয়ে। ওরা ছিঁড়ে খেতে চায়
পথে-হেঁটে-যাওয়া আর বারান্দায় দাঁড়ানো অনেক
নারী পুরুষকে যেন। অকস্মাৎ একত্রে সবাই
লাঠিসোঁটা আর কেউ-কেউ স্টেনগান নিয়ে খুনি

পাখিদের মেরে প্রিয় শহরের আর গ্রামের বাশিন্দা মিলে
তাড়াল নিমেষে দূরে অজানায়। শান্তি এল ফিরে।
২২.১০.২০০৫

আখেরে আঁধারে

ঢের পথ হেঁটে আখেরে আঁধারে
জনহীন স্থানে এক কৃষ্ণকায় দালানের কাছে
এসে থামতেই অকস্মাৎ বড় বেশি
কুচকুচে কালো রুমে দরজার বুক খুলে গেল।
শূন্য, অতিশয় ছমছমে ঘরে অকস্মাৎ চার
দেয়ালের বুক চিরে রক্তধারা বইতে থাকার
সঙ্গে সঙ্গে ক'জন অদেখা যুবতীর
কান্নায় চৌদিক বুকফাটা মাতমের ডেরা হয়!
শোণিতের ধারাময় অন্ধকার ঘর থেকে যত
তাড়াতাড়ি বেরুবার স্পৃহা
জেগে ওঠে মনে, যত পা বাড়াই দরজার দিকে,
তত পদদ্বয় যেন শীতল পাথরে বেশি গেঁথে যেতে চায়।
তবে কি আমার মুক্তি নেই কিছুতেই? তবে কি আখেরে
মরণপ্রতিম চার দেয়ালের ভেতরেই এক
অজানা কঙ্কাল হয়ে থেকে যাব চিরকাল? আখেরে সহসা
বুক-ফাটা শব্দ করে মুক্তি পেতে চাই। পড়ে থাকি যেন পথে!
২৯.০৭.২০০৫

আমার অন্তর জুড়ে শহুরে-গ্রামীণ সুরধারা

এ এমন কাল বন্ধ চোখ খুলতেই দেখি
শরীর-জ্বালানো তেজ নিয়ে
আমাদের পোড়ায় কখনও, কখনও-বা
উত্তেজিত করে খুব ছড়াতে দ্রোহের অগ্নিশিখা।
দিনরাত বৃষ্টিধারা দেয় না ভাসিয়ে নানা শহর ও গ্রাম।
কখনও-সখনও বর্ষা, যতদূর জানি,
কোনও কোনও কবির, লেখার
খাতার উন্মুখ পাতা বর্ষার ধারায় সেজে ওঠে।
বয়স হয়েছে ঢের। জীবনের নানা
ক্রূর ঘাত-প্রতিঘাতে কেউ-কেউ ভণ্ড বান্ধবের
পোশাকে দিয়েছে হানা অতর্কিতে। যখন পেয়েছি
টের, ততদিনে বড় দেরি হয়ে গেছে; বয়ে গেছে কৃত্রিমতা।
আমার এ বয়সে ও কখনও দাদা, নানা
বাবা, চাচাদের জন্মস্থান পাড়াতলী
গ্রামে যাই ঢের পথ পেয়েছি মেঘনা নদী। ছলছলে জল,
ক্ষেতের সবুজ ঢেউ চোখে কত স্বপ্ন দিত জ্বেলে।
শ্রাবণের রাতে শুয়ে বিছানায় অথবা টেবিলে
একলা নিঃশব্দে ঝুঁকে কবিতা লেখার কালে চোখে
হঠাৎ ঝলসে ওঠে জননীর মুখ। হাতে তাঁর, মনে হ'ল,
ঝলসিত কোরানশরিফ। ঘরে ভাসে স্বর্গীয় সুরের রেশ।
কখন যে শরতের জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে
এসে দাঁড়িয়েছি একা হাওয়ায় দোলানো
ফসলের ক্ষেতের সান্নিধ্যে, বুঝ উঠতে পারিনি-
যেন কেউ দেখাচ্ছে আমাকে স্নেহভরে এই দৃশ্য।

শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি চাঁদ
হাসছে কৌতুকে এই শহুরে লোককে দেখে, যার
সমস্ত শরীর ফুঁড়ে কী সহজে বেরুচ্ছে গ্রামীণ রূপ।
আমার অন্তর জুড়ে শহুরে-গ্রামীণ সুরধারা।
১৬.০৮.২০০৫

আমার শহর, প্রিয়তম শহর

তোমরা আমাকে ঠেলেঠুলে ঢের নিচে
ফেলে দিতে চাও-
বুঝতে আমার খুব বেশি মুশকিল
হয় না, যেমন বেড়ালের হাসি ফোটে অন্ধকারে!
তোমরা তো জানোই, কক্ষণও আমি কার
বাড়া ভাতে বালি
ছিটিয়ে নিজের বগলকে ঢোল ভেবে
অতিশয় মৌজে ঘরে নর্তন করব।
এই তো এখন বসে আছি, কেউ নেই
ব'লে দৃষ্টি মেলে
নীরবে আমার দিকে, সে কি অকস্মাৎ
আমাকে হত্যার জন্যে লড়ছে হঠাৎ!
না, মিথ্যা আমার মনে কালো কিছু ছায়া
আমাকে সহসা
ভড়কে দেয়ার জন্য এসে পড়ছে এবং
আমি সেই ফাঁদে দ্রুত পা দিয়ে ডুবছি!
জানালার বাইরে পুষ্পিত চাঁদ হাসিমুখে

তাকিয়ে রয়েছে
পৃথিবী এবং এই কবির দিকেই অপরূপ বদান্যতা
ছড়িয়ে, নন্দিত এই শহরের মহিমাবর্ধনে ঐকান্তিক।

এই তো দাঁড়িয়ে আছি

এই তো দাঁড়িয়ে আছি তোমার কাছেই
কিছু কথা বলার আশায়। জানতে কি
চাও সেই কথা
এখনই রাত না পোহাবার
আগেই? কী করে সম্ভব তা? সে-সাধ্য আমার নেই।
অপেক্ষা তোমাকে কিছু করতেই হবে।
এই তো আমার হাত ছড়ানো তোমার
দিকেই কখন থেকে-স্পর্শ করো, তুলে
নাও হাত; দেখবে হাতের স্পর্শ যে-কোনও যুবার
চেয়ে কিছু কম স্পষ্ট জলজ্যান্ত নয়।
দেখছ তো আমাকে এখন বড় বেশি
কাছ থেকে। পাচ্ছ নাকি উষ্ণ
বিশ্বাস বয়স্ক মানবের? লক্ষ করলেই, হে মানবী,
বুঝবে তোমার গালে, ঠোঁটে পুরুষের চুম্বনের ফুলঝুরি!
মেয়ে তুমি আমার মাথায় কিঞ্চিৎ কালির
আভা দেখে চমকে উঠো না। যদি ভেবে
দ্যাখো, ঠিক দেখতে পাবেই পৌরুষের গুণাবলি
এখনও অক্ষুণ্ণ খুব। তোমার কামিনী
প্রাণের বাগান তীব্র প্রস্ফুটিত হবে ঠিক। তুমি

আমাকে বসন্তকালে ধুলোয় লুটিয়ে ফেলে যাবে না নিশ্চিত।

একটি অনন্য মালা

তিনজন আলেমের বেজায় সুনাম শুনে তাদের
সামনে হাজির হয়ে বড় বেশি
কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়লেন, যেন তিনি তাঁদের
একজন নিয়মিত মাইনে-পাওয়া খাদেম।
সেই আগন্তুকের শরীরে যে-জামাকাপড়
মাঝে-মাঝে কাঁপছিল বাতাসে।
কারা যেন, মনে হল লোকটির,
চিৎকার ক'রে বলছিল,-
'কেন পা রেখেছিস এখানে হতভাগা
দূর হ এক্ষুনি, ঠাঁই নেই তোর এখানে?'
আখেরে তাকে যেতেই হ'ল সেখান
থেকে অপসারিত হয়ে। ভাবেনি সে, যারা গজল
রচনা করে, জয় করে হাজার
মানুষের মন, তারা এমন কঠোর, এমন
খেয়ালি হয়। তাদের খাদেম যারা তারাও কি
এমন এলোমেলো, আকাশের নীলিমায় ভাসমান?
যে বিরূপ লোকটি শহুরে পরিবেশে নিয়ত
কবি ও কাব্যসিদ্ধ গুণীদের অবহেলা, কাব্যপ্রেমী লোকটি
শহরের রুক্ষতা, ধূসর অবহেলা পিছনে
ফেলে রেখে গ্রামাঞ্চলে জীবনের চাকা ঘোরানোই উত্তম।
দেখা গেল লোকটি কাঁধে কলস-ভরা

জল বয়ে নানা জায়গায় হেটে সামান্য
অর্থের বিনিময়ে বিলি করত তেষ্টা-মোটানো কিছু পানি
আর মনে-মনে তার উচ্চারিত হত স্রষ্টার কিছু নাম।
অতঃপর অতি সাদাসিধে কাপড়-পরা
লোকটির ঘটি সাধারণ গ্রামবাসীদের নিকট
বড় পরিচিত, প্রিয় হয়ে ওঠে, তবে সেই লোকটি,
বলা যেতে পারে, আত্মীয়ের চেয়েও
অধিক বরেণ্য হয়ে ওঠেন। কেউ-কেউ ভাবেন,
তাদের প্রিয় জনটির উপর মধ্যরাতে ফেরেশতার ফুল ঝরে!
আখেরে বেশ কিছুদিন পরে সেই পানি-বিক্রোতার
ফেলে-আসা শহরের চতুর্দিক ঝলসানো বিজ্ঞাপন
সাড়া তুলল সর্বত্র। নির্ধারিত বিকেলে
নানা দিকে বিভিন্ন দেশের বড় বেশি কবি এবং
কবিতাপ্রেমীদের আসর জমল পরোদমে,
নানা স্থানের নানা কবি আবৃত্তি করলেন কবিতা।
মাথায়, কাঁধে আশ্চর্য নিখাদ জল কাঁধে বয়ে
যে-লোকটি গ্রামেগঞ্জে ঘুরেছে
এবং অবসরে আসমানে দৃষ্টি মেলে কাটিয়েছে,
সে বসেছিল ভিড়ের বেশ কিছু দূরে একা-'এমন সময়
দূর থেকে, কী আশ্চর্য, নাম ধ'রে ডাক এল তার।
অবাক, বিচলিত সেই জন দৃষ্টি মেলে দিল আকাশে।
বেশ কিছুক্ষণ চতুর্দিকে নানা শব্দের জন্ম হলে আখেরে
সেই জল-বিক্রোতাকে খুঁজে পেয়ে
তাকে একজন ধীমান তার সাধারণ গলায়
একটি অনন্য মালা দুলিয়ে তাকে বুকে জড়ালেন।

২৮.০৯.২০০৫

এতকাল বৈঠা বেয়ে

এই আমি এতকাল বৈঠা বেয়ে প্রায়
তীরে এসে ডিঙি, হায় ডুবে
যেতে দেব? হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি-মাথা-
ভর্তি শাদা চুল ওড়ে দূরন্ত বাতাসে।
পাড়ার অনেকে আজও আমার তেজের
তারিফে প্রায়শ মেতে ওঠে, গুণ গায়।
কখনও শ্রমের পরে ক্লান্ত আমি ছেঁড়া বিছানায়
গা ঢেলে দিলেই ঘুম এসে চুমো খায় আর
কিছুক্ষণ কিংবা বেশ কিছুক্ষণ কেটে
গেলে হুর-পরী ডানা মেলে এই
গরিবের হৃদয়কে নাচের মাধ্যমে
বেহেশতের অপরূপ হুরিময় নর্তকীর নাচে
চঞ্চলিত হয় চতুর্দিক, হয়ে ওঠে তারাময়!
বৈঠাবায়ী মাঝি হয়ে ওঠে বেহেশতের অধিবাসী!
অকস্মাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে মায়াবী স্বপ্নের
অপরূপ স্পর্শের গৌরব ভুলতে না পেরে ভাবি,-
শুধু ভাবি নর্তকীর অঙ্গভঙ্গি, হাসির ফোয়ারা,
ওদের নাচের ভঙ্গি। শরীরের ঘ্রাণ
তাদের মাতাল করে, যেন এখনও জীবন্ত।
এই আমি বৈঠা বেয়ে বারবার সেই স্বপ্ন দেখি।
জেনে গেছি যে-পথে হাঁটতে হবে, সেই পথ
বড় বেশি কণ্টকিত, তদুপরি নানা দিকে খুব
ভয়ঙ্কর রক্তলোভী পশুর নিয়ত
বিচরণ পড়ে চোখে। অথচ সে-পথ

এড়িয়ে উদ্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছুতেই হবে ঠিক।
ভয়াবহ সেই পথে মনুষ্য-হাড়ের স্তূপ কঙ্কালের!

কখনও কখনও মানুষেরই হাত

কে তুমি আমাকে দূর অজানায় নিয়ে
যাওয়ার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়ছ এমন
অপূর্ব মধুর সুরে? তুমি কি প্রচ্ছন্ন জাদুকর?
তোমার জাদুর ধোঁয়া আমার চৈতন্যে
ছাড়তে কোরো না চৈষ্টা, ব্যর্থতায় সকল প্রহরে
খাবি খেয়ে পরিণামে হারাবে চেতনা।
জানি তুমি আমার কথায় এতটুকু করছ না
কর্ণপাত; আমাকে নির্বোধ
ঠাউরে অন্তরে হেসে আমাকে জাদুর ধূম্রজালে
বন্দি করে রেখে দেবে চিরতরে অশুভের গোলাম বানিয়ে।
না, আমি তোমার কোনও তেলেসমাতির
ধোঁয়ায় হারাব জ্ঞান-এই আশা ঝবরে কালিতে।
আমার জীবন শুধু রাশি অপরূপ ফুল
নিয়ে গুণগ্রাহীদের আসরে কাটিয়ে
পুরস্কার লাভের স্বপ্নের ঝলমলে পথে ঘুরে
বেড়ানোর নকল সুখের খেলা নয় বলে জানি।
এই তো দেখছি আমি পাহাড়ি পাথর থেকে দ্রুত
গড়িয়ে পড়ছি আর শরীরের নানা অংশ ছিঁড়ছে ভীষণ।
তা হ'লে কি এভাবেই পঙ্গুর ধরনে সারা জীবন আমাকে
নিজের ব্যর্থতা বয়ে কাটাতেই হবে? পথে হেঁটে

গেলে অন্য পথিকেরা আমার পঙ্গুত্ব দেখে মনে-মনে কেউ-
কেউ কষ্ট অনুভব করে। দিন যায়, দিন আসে।
দেখছি মানুষ কী সহজে মানুষের রক্ত ঝরায় এবং
কখনও কখনও মানুষেরই হাত বহু মানুষকে রক্ষা করে।
০৪.১০.২০০৫

কখনও-সখনও

কখনও-সখনও পারবে না যেতে একা
যদি বলি, প্রকৃত বন্ধুর কথা অত্যন্ত বিরল
এমন সুন্দর এই গলিতে আমাকে হেঁটে যেতে
দ্যাখে প্রায়শই তারা কিংবা
তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায়শ দেখতে
পেয়ে কেউ-কেউ হেসে সালাম করেন। কেউ ঠোঁটে
খেলিয়ে মুচকি হাসি দ্রুত চলে যান
যে যার গন্তব্যে আর আমি কিছু মনে
না করেই হেঁটে যেতে থাকি কোনও বন্ধুর বাসায়।
যদি বলি আমিও ভণ্ডামি ক'রে বসি
কখনও-সখনও কোনও মজলিশে, তা হ'লে হবে না
ভুল; তাই নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়।
তখন স্মৃতির জাল ফুঁড়ে
বেরিয়ে আসেন মরহুমা মা আমার, তখন দু'চোখ
দিয়ে তাঁর ঝরছে আগুন আর পরমুহূর্তেই
করুণ দু'চোখ দিয়ে আমাকে দেখেন ভালোবেসে,-
যেন আমি ছোট খোকা-পারব না যেতে একা!

মধ্যরাতে ছিলাম নিজের ঘরে শুয়ে বড় একা,-
আচানক মনে হ'ল, যেন কার নরম হাতের
মৃদু স্পর্শ ছুঁয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত আর
তাঁর কণ্ঠস্বর বেদনার্ত লোকটির জননীর বটে।
খানিক পরেই কোথায় যে মিলায়, যায় না বোঝা
কিছুই তো। বারবার শুধু বড় করুণ গানের সুর শোনো
চলন্ত পথিক আর অতিশয় দিশেহারা চাকরির সন্ধানে
কখনও-সখনও দূর থেকে ভেসে-আসা মৃদু সুর শোনা যায়।
২৮.১০.২০০৫

কদাকার মূর্তির ভিতর থেকে

যেয়ো না, দাঁড়াও ভাই। খানিক দাঁড়ালে,
আশা করি, বড় বেশি ক্ষতি
হবে না তোমার। দেখছ তো এই আমি
একলা পথের ধারে পড়ে আছি বড় অসহায়
কখনও ইঙ্গিতে, কখনও-বা উঁচিয়ে গলার স্বর
পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণে লুব্ধ হয়ে পড়ি
বারবার জ্ঞাতসারে, কখনও আজান্তে। অকস্মাৎ
পায়ের পুরনো ক্ষত বেদনা-কাতর হয়ে ওঠে।
হঠাৎ পায়ের ক্ষত আমার দৃষ্টিতে কেন যেন
স্বর্গের পুষ্পের মতো ফুটে ওঠে। তা হ'লে কি
আমি উন্মাদের অবিকল ছায়ারূপে প্রতিভাত
বর্তমানে? বেলা শেষ হলে ফের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাব গর্তে!
গর্তে ঢুকে যাব-যাব করতেই আকাশে চাঁদের

মায়াময় মুখ দেখে আমি নিজের ভিতর
পরিবর্তনের ছোঁয়া অনুভব করি। যেন আমি
কদাকর মূর্তির ভিতর থেকে সুন্দরের প্রিয় আবির্ভাব!
২০.০৯.২০০৫

কদাকার মূর্তির ভিতর থেকে

যেয়ো না, দাঁড়াও ভাই। খানিক দাঁড়ালে,
আশা করি, বড় বেশি ক্ষতি
হবে না তোমার। দেখছ তো এই আমি
একলা পথের প'ড়ে আছে বড় অসহায়।
কখনও ইঙ্গিতে, কখনও-বা উঁচিয়ে গলার স্বর
পথচাদের দৃষ্টি-আকর্ষণে লুব্ধ হয়ে পড়ি
বারবার জ্ঞাতসারে, কখনও অজান্তে। অকস্মাৎ
পায়ের পুরনো ক্ষত বেদনা-কাতর হয়ে ওঠে।
হঠাৎ পায়ের ক্ষত আমার দৃষ্টিতে কেন যেন
স্বর্গের পুষ্পের মতো ফুটে ওঠে। তা হ'লে কি
আমি উন্মাদের অবিকল ছায়ারূপে প্রতিভাত
বর্তমানে? বেলা শেষ হলে ফের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাব গর্তে!
গর্তে ঢুকে যাব-যাব করতেই আকাশে চাঁদের
মায়াময় মুখ দেখে আমি নিজের ভিতর
পরিবর্তনের ছোঁয়া অনুভব করি। যেন আমি
কদাকার মূর্তির ভিতর থেকে সুন্দরের প্রিয় আবির্ভাব!

কবির কল্পনার মায়াবিনী

সে যেন আমাকে সদা ছায়ার ধরনে সেঁটে থাকে,
জানি না কিসের জন্যে। তার এই কাণ্ড
আমাকে নিক্ষেপ করে বিরক্তির বেড়াজালে, কিন্তু
কিছুতেই পাই না রেহাই।
কখনও কখনও আমি চুল ছিঁড়ে নিজের মাথার
স্বস্তি পেতে চাই, কিন্তু সেই নটবর
অদ্ভুত হাসির বৃষ্টি ছিটিয়ে আমার মনে আরও
বেশি বিরক্তির ঢিল ছুড়ে দেয় শিকারের দেকে।
অবশ্য করি না ত্যাগ শেষতক আমার নির্দিষ্ট
কাজ, দিব্যি চালাতেই থাকি কলমের
কাজ, যতক্ষণ ঠিক শব্দ বসে না যথার্থ স্থানে,
মাথায় চলতে থাকে নানাবিধ শব্দের জরুরি আসা-যাওয়া।
জানা আছে জ্ঞানীদের নানা বাণী, যেসব কবির
কোনও-কোনও কাজে উপকারী-যেগুলির
প্রয়োগে নতুন পথ খুলে যেতে পারে
এবং সে-পথে হেঁটে যেতে-যেতে নয়া পথ গ'ড়ে ওঠে।
একদিন যে-ভাবনা ঠিক পথে জ্বলজ্বলে ক'রে তোলা ঢের
মুশকিল ছিল, সার্থকের হাত ধরা
ছিল যেন অসাধারণ, কবির কল্পনার মায়াবিনী!

০৫.০১.২০০৬

কীভাবে আমার উদ্ধার হবে?

কে যেন অনবরত ডাকছে আমাকে বেজায়
উচ্চস্বরে, যেন এভাবে
না ডাকলে মাথার বাজ পড়বে,
চতুর্দিকে আগুন জ্বলবে, পুড়িয়ে
ছারখার ক'রে দেবে নিমেষে সবকিছু।
বেজায় মুশকিলে
প'ড়ে গেলাম যেন। কখনও ডানে, কখনও
বামে ছুটে যাই, চিৎকার করতে গিয়ে
গলা যায় বন্ধ হয়ে, কখনও
ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যাই।
খানিক পরে মনে হয়, কারা যেন
আমার দিকে এগিয়ে আসছে আমাকে বিপদ
থেকে উদ্ধার করার জন্য আর আমি
মাটিতে প'ড়ে গোঙাচ্ছি, ফেটে-যাওয়া
আমার মাথা থেকে ঝরছে রক্তধারা।
গোঙাতে গোঙাতে কখন যে হঠাৎ
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিছুতেই স্মৃতিপটে ভাসাতে
পারছিলাম না। কে আমি? কোথায় জন্মস্থান আমার-
কোনওকিছুতেই ভেসে উঠছে না স্মৃতির
পরদায়। কে আমি? কী ক'রে এলাম এখানে?
ঘোর অন্ধকার ঘিরে ধরেছে
আমাকে। মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজেই
অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি কি পাগল হয়ে গেলাম?
কীভাবে আমার উদ্ধার হবে? আমি কি

মনুষ্যত্বের আড়ালে থেকে যাব কোনও?

কে তুমি আমাকে

কে তুমি আমাকে স্পর্শ করলে
আচমকা শেষরাতের
অন্তিম প্রহরে? চোখ খুলতেই দেখছি
অপরূপ তুমি ঝুঁকে রয়েছে
আমার মুখের উপর চুমো খাওয়ার
ভঙ্গিতে। আমি ভাবতেই পারিনি এমন দৃশ্য।
অপরূপ প্রতিমার মতো হে তরুণী,
তোমার হাসি দেখে মনে হ'ল, এমন
ঠোঁট-ঝরা হাসি দেখে আমি তো কোন ছার
ফেরেশতাও চমকে উঠে তোমাকে স্পর্শ করার
জন্য উদ্বেল হয়ে উঠত। তোমার একটি চুমোর
বদলে হয়তো বেহেশত ছেড়ে দুনিয়ায় বসত চাইত।
খানিক পরে, তখনও আলো খুব জোরালো
হয়নি, ছায়ার মতো অস্তিত্ব যার সে আমার
খুব কাছে এসে গুনগুন করে কী যেন
বলতে চেয়ে বলতে পারছে না। তার দু'চোখ
থেকে ঝরতে শুরু করল ফোঁটা ফোঁটা পানি এবং
আমি তাকে স্পর্শ করতে গিয়ে ধুলোয় গড়াই।

৩০.১২.২০০৫

কেমন আলাদা, স্বর্গফেরা

কখনও এমন হয়, নিজেকে বড়ই
বেগানা কে এক লোক বলে
মনে হয়। যখন আমার দিকে কেউ
তাকায় অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে, বেজায় ভড়কে যাই।
যখন যেখানে যাই তখনই সবার দিকে হাসি-
মুখে কথা বলি সকলের সঙ্গে যদি
বেজায় ঝিমিয়ে পড়ি, তা হ'লে নানান পথে হেঁটে
পৌছে যেতে পারি ঠিক জ্বলজ্বলে কাঙ্ঘিত প্রদেশে।
ঘুম থেকে জেগে দেখি আমার চৌদিক ঘিরে আছে
ক'জন জবরদস্ত অস্ত্রবাজ। নির্ঘাত দুর্দশা
ভেবে নিয়ে আকাশের দিকে চোখ মেলে ধুকধুকে
বুক নিয়ে চির-অন্ধকারের আশায় চোখ খুলি, বন্ধ করি।
হঠাৎ কে যেন দূরে গান গেয়ে পরিস্থিতি দ্রুত
বদলে আমার মনে অপরূপ কিছু
তরঙ্গের সৃষ্টি করে। উপরন্তু কতিপয় নরনারী নেচে গেয়ে প্রাণে
আমার বাগান তৈরি করে আর আমি অন্য কেউ হয়ে যাই।
কেন যে হঠাৎ আশেপাশে কখনও না-দেখা মুখ
জেগে ওঠে, ওরা বড় মধুর সুরের ঢেউ তুলে
চারদিকে গ'ড়ে তোলে নতুন অপূর্ব গেরস্থালি। আমি সেই
সৃষ্টির আলোয় দীপ্ত হয়ে কেমন আলাদা, স্বর্গফেরা!

১৩.০৯.২০০৫

খেলাচ্ছলে ভুল ক'রে

বহুদিন ধ'রে ঢের পথে হেঁটে হেঁটে
প্রায় সন্ধেবেলা পৌঁছে যাই
কেমন আশ্চর্য স্থানে। জনমানবের
চিহ্ন নেই আশেপাশে কোনওখানে, কেবল তিনটি
কেমন আজব গাছ দাঁড়ানো বেজায়
উদ্ধত ধরনে, যেন এক্ষুনি কামড়ে খাবে বেখাপ্পা আমাকে।
বৃক্ষদের রুক্ষ কণ্ঠস্বর আমাকে প্রবল ধাক্কা
দিয়ে উচ্চারিত হয়, 'এখানে আসার
যোগ্যতা তোমার লাভ করার সুযোগ হয়েছে কি?
নাকি খেলাচ্ছলে ভুল ক'রে এই এলাকায় প্রবেশ করেছ!'
কী জবাব দেব কিছু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে চুপ
থাকা ছাড়া ছিল না উপায়। মাথা-ছোট
বালকের খেলারত মাথার ধরনে
বেজায় ঘুরতে থাকে যেনবা লাটিম। কিছুক্ষণ
পরে দেখি প'ড়ে আছি ধূসর মাটিতে। তা হ'লে কি
আমি মানুষের কোনও ধ্বংসলোভী জমিনের হয়েছি খোরাক?
চকিতে পড়ল চোখে আসমানে চাঁদের, তারার
উল্লাস এবং প্রায়-মৃত আমার পাশেই একা
আছেন দাঁড়িয়ে বুজরুক দীর্ঘদেহী। তিনি গাঢ়
কণ্ঠস্বরে বললেন, "এখানে আসার জন্যে দেব না তোমাকে
অপবাদ। তবে বড় বেশি বিপদের ক্রূর ছায়া
এখানে কাঁপতে থাকে মৃত্যুর দুয়ার খুলে রেখো"।
দৌড়বাজ পুরুষের ধরনে হঠাৎ ছুটে যাই
সামনের দিকে চোখ রেখে, দ্রুত হাওয়া

আমাকে পেছনে ঠেলে রাখতে বেজায়
বদ্ধপরিকর আর আমি শুধু ছুটছি, ছুটছি।

গুণী বন্ধু আনিসুজ্জামানের উদ্দেশে

যখন পাঞ্জাবি আর পাজামা চাপিয়ে
শরীরে সকালে কিংবা বিকেলে একলা হেঁটে যান
প্রায় প্রতিদিন দীর্ঘকায় সবুজ গাছের
তলা দিয়ে তাঁকে বাস্তবিক সাধারণ মনে হয়।
যখন বাজারে গিয়ে মাছ, তরকারি
কিংবা মাংস কেনার তাগিদে
কসাই-এর সঙ্গে দামদর করেন কি ঠিকমতো?
তখন কিছুতে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে
কিছু ছাত্র-পড়ানো শিক্ষক ছাড়া অন্য কিছু ভাবা
মুশকিল। মাছের হিসাব ছেড়ে বিক্রেতার সংসারের খোঁজ নেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের ক্লাসে
সেই অধ্যাপক ধীরে প্রবেশ করলে
ক্লাস মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত বক্তৃতা তাঁর সারাক্ষণ-
ছাত্রছাত্রী সবাই সাজাত মনে শ্রদ্ধার মঞ্জরি।
আত্মভোলা নন তিনি, নন অচেতন সমাজের
কল্যাণ কি অকল্যাণ বিষয়ে কখনও যতদূর
জানি দৃষ্টি তাঁর সদা মানবের প্রগতির দিকে
প্রসারিত। কী প্রবীণ, কী নবীন সকলের বরেণ্য নিয়ত।
এখনও সিদ্ধির পরে, খ্যাতির শিখরে পদার্পণ
করেও সাধনা তাঁর থামেনি, বরং মাঝে-মাঝে

এখনও গভীর রাতে ঘুমন্ত জীবনসঙ্গিনীর পাশে শুয়ে
অথবা টেবিলে ঝুঁকে থিসিসের ভাবনায় কাটান প্রহর।

জ্যোৎস্নামাখা মধ্যরাতে

জ্যোৎস্নামাখা মধ্যরাতে নিঝুম পথে
একলা আমি যাচ্ছি হেঁটে।
আগে পিছে দৃষ্টি রাখি, কিন্তু কোনও
আদম কোথাও দেয় না দেখা।
এই যে আমি বিজন পথে বড় একা
খুঁজছি ডেরা একটু শুধু ক্লান্তি-কণা মুছে নিতে
কিংবা ঘুমের মেঘে ভেসে জড়িয়ে কোনও
সোহাগিনীর দীপ্ত শরীর উধাও হতে।
হেঁটে-হেঁটে পথের ধারে একটি গাছের
কাছে গিয়ে ছায়ার আদর গায়ে মেখে
ঋষির ঢঙে বসে পড়ি। হঠাৎ দেখি, সামনে আমার
দাঁড়ানো এক বাউল হাতে একতারাটা ঝুলিয়ে নিয়ে।
দেখেই তাকে উঠে দাঁড়াই, শ্রদ্ধা জানাই নুইয়ে মাথা।
চেহারা তার চেনা খুবই, সাধক তিনি লালন সাঁই-
মাথায় আমার হাত রেখে তাঁর স্নেহ বুলিয়ে,
একটি চোখের আলোয় তিনি দেন ভাসিয়ে পথিকটিকে।
একতারাকে সুর বানিয়ে লালন এক লালনগীতি
গাইতে গাইতে গেলেন মিশে জ্যোৎস্না-ধোওয়া
চক্রবালে। আমি শুধু মন্ত্রমুগ্ধ চেয়ে থাকি
ধূসর পথে; সাগর মেতে ওঠে মনে, পা চালিয়ে এগিয়ে যাই।
১৪,১০,২০০৩

ঢের পথ ঘুরে এক হ্রদের কিনারে

ঢের পথ ঘুরে এক হ্রদের কিনারে এসে বসি
সন্ধেবেলা শারীরিক ক্লান্তি মুছে ফেলে
শান্তির শীতল স্পর্শে ডুবে
যাওয়া খুব সহজেই হবে-
এমন ধারণা খেলা করছিল কিছুক্ষণ থেকে।
ফলত হ্রদের দিকে তাকাই আনন্দে প্রীত জলে।
মনে হ'ল, প্রীত জল থেকে মাথা তুলে
তাকাল আমার দিকে অপূর্ব সজল চোখে আর
ইশারায় দিল ডাক। অপরূপ তরুণীর আহ্বান উপেক্ষা
করার ক্ষমতা কোনও মানবের নেই। আমি জলে নেমে
যাওয়ার আগেই দৃশ্য তরুণীবিহীন হয়ে গেল।
বিষাদ আমাকে ছেয়ে ফেলে, তবুও মুক্তির আভা জাগে।
বেশ কিছুক্ষণ পর আসমানে যুবতীর সুডৌল স্তনের
মতো চাঁদ জেগে ওঠে। জ্যোৎস্নাধারা হ্রদ,
পাশের গাছপালা, ঝোপঝড় যেন
বাতাসের স্পর্শে নর্তকীর মতো হয়ে যায় আর আমি
লোভী বালকের মতো তাকাই কাছের
প্রকৃতির দিকে, ভাবি কী মহিমা ছড়ানো চৌদিকে।
সমুখে তাকিয়ে ভাবি, আমি কি এখন হ্রদে নেমে
ভাসাব নিজেকে? হয়তোবা আমার প্রকৃতি-প্রেমে কোনও
জলপরী মুগ্ধ হয়ে কাটবে সাঁতার বেপরোয়া
কবির সান্নিধ্যে-হয়তোবা তার মায়া
ক্ষণিকের হলেও বয়েসি লোকটির কতিপয় মুহূর্তকে
রাখবে অক্ষয় ক'রে। দেবে কি কবিকে অমরতা? **১৮.০৮.২০০৫**

দিগন্তের বুক চিরে

কখনও কখনও আমি একান্তে নিজেকে
বিশ্লেষণ করার ইচ্ছায় গৃহকোণে
চেয়ারে হেলান দিয়ে বসি,
আকাশ-পাতাল ভাবি, এলোমেলো অনেক ভাবনা
আমাকে বিব্রত করে। বুকশেলফ থেকে
বই টেনে নিই দুশ্চিন্তার মাকড়সা-জাল থেকে মুক্তি পেতে।
তবুও নিস্তার নেই যেন, আচমকা ভাবনার
খোলা পথে দেশের দশের ছায়াছবি
রূপায়িত হয়ে
কোন সে পাতালে ঠেলে দেয়, হাবুডুবু
খেতে থাকি। কারও সাতে-পাঁচে নেই, তবু
কেন ঘোর অমাবস্যা ভাবনার মূর্ণিমাকে দ্রুত গ্রাস করে?
কী এক আজব খেলা চলছে স্বদেশে ইদানীং,
বুঝেও বুঝি না যেন! আমরা কি
সবাই এখন উলটো পায়ে হাঁটছি কেবল? ব্যতিক্রম কিছু
আছে বটে, তবে তারা এক কোণে ব'সে
থিসিসের মায়াজালে বন্দি হয়ে ক্লান্তির বিস্তীর্ণ কুয়াশায়
পথ, বিপথের ফারাক না বুঝে ঘুরছেন, শুধু ঘুরছেন।
কালেভদ্রে কিছু কলরব শ্রুত হয় পাড়ায় পাড়ায় আর
জাগৃতির ঢেউ দ্রুত বুদ্বুদের মতো
মিশে যায়। এই কি নিয়তি সকলের? 'নয়, নয়
কখনও তা নয় ধ্বনি জেগে ওঠে দূর দিগন্তের বুক চিরে।

দুলছে হাওয়ায় তাজ

বেজায় ছোটোখাটো একটি
পক্ষীশাবক মাটিতে প্রায় গড়াতে
গড়াতে এগোচ্ছিল। ওকে দেখে
বড় মায়া হ'ল। জানি না কী ঘটবে ওর
ভবিষ্যতে। এই খুদে পাখি কি কাঁটাবন,
ইট-পাথর কিংবা কারও পায়ের আঘাত
পারবে সইতে? পারবে কি
বেঁচে থাকতে শেষতক?
কিছুদিন পর সেই একই পথ অতিক্রম
করার কালে কে যেন আমার
কানে সুর ঢেলে করল উচ্চারণ, শোনো
হে পথিক, তুমি যে অসহায় ক্ষুদ্র
পক্ষীশাবকটিকে দেখে করুণায় আপ্লুত হয়েছিলে
অবেলায়, দ্যাখো চেয়ে ঐ গাছটির উঁচু ডালে
কেমন যুবরাজের ধরনে বসে আছে। দ্যাখো ওর
মাথায় কেমন দুলছে হাওয়ায় তাজ।

দেখছি এখন এই

দেখছি এখন এই খানিক দূরেই পথে এক
বেজায় জখমি লোক প'ড়ে আছে আর
একটি কুকুর তার পাশে ঘোরাঘুরি ক'রে
শুঁকছে আহত প্রাণীটিকে। জখমি পথিক প্রাণহীন।

এমন সময় আসে যখন শহরে আর গ্রামে
সামান্য কথায় কোনও মানুষ অপর মানুষের
প্রাণ কেড়ে নেয় যেন গাছের সামান্য পাতা-
এভাবেই কত-যে প্রাণের হয় অবসান
খবর রাখে কি কেউ? হয়তো রাখলে নিয়মিত
অনেক বিশাল খাতা দিয়ে ঢের ঘর ভ'রে যেত।
কে তুমি এখন এই আমার আঁধার-হয়ে আসা
কালে এলে জেনে নিতে আমার গোপন
কথাগুলো খুঁচিয়ে জেনে নিতে? যাও তুমি
চ'লে যাও। যেটুকু শান্তির মৃদু হাওয়া বয়ে যায়
অন্তরে নীরবে তাকে বইতে দেয়ার পথে ছুড়ে
দিয়ো না পাথর এই শান্তির চরণে।
এখন আমরা যাব দূরে, বেশ দূরে-
যেখানে মানব-শত্রুদের শয়তানি,
নানাবিধ হয়রানি শেষ করে সারাক্ষণ মঙ্গলের
পথে হেঁটে যাবে, যদি কোনও পথ কেউ
আগুন জ্বালিয়ে দেয়, ভেঙে ফ্যালে ঘরবাড়ি
তা হ'লে তাদের অপরাধ শাস্তির বেতের বাড়ি
সুদীর্ঘ জেলের ভাত খেতে-খেতে কাটাবে সময়!

নিজেকে বুঝে নিতে চাই

প্রতিদিন নিজেকে খণ্ডিত ক'রে বুঝে নিতে চাই
এতকাল এত পথ হেঁটে,
এত ধুলোবালি গায়ে ঠাঁই দিয়ে আখেরে কী পেয়ে

চৌদিকে ছড়াব ফুলঝুরি? কেউ-কেউ
তাকায় আমার দিকে যেন সে দেখছে কোনও-এক
আজব অদ্ভুত কিমাকার জীব যাকে ধরে নিতে
হবে ঠিক চিড়িয়াখানায়! হাসব কি
কাঁদব না ভেবে আসমানে চোখ রেখে পথ হাঁটি।
মধ্যরাতে কে যে ডাকে ঘুমন্ত আমাকে
পারি না বুঝতে কিছুতেই। দোর খুলে
তাকাই আঁধারে যতদূর পারি কালিমাকে ভেদ
ক'রে আর বাড়াই দু'হাত ছুঁতে আগন্তু কটিকে।
এই যে তোমরা আজ সারাদিন দাঁড়িয়ে রয়েছ
রোদে পড়ে বৃষ্টির ধারায় ভিজে,
কী লাভ হয়েছে তাতে? দয়াপরবশ
কেউ কি এসেছে একমুঠো খাদ্য কিংবা পানীয়ের
বাটি নিয়ে? না, এখন এই আজকের দুনিয়ায়
আসে না সহজে কেউ ক্ষুধার্তের হাহাকার দূর করে দিতে।
না, আমার উক্তিতে নিখাদ সত্য নেই। আজও এই
ইট-চুন-পাথরের যুগেও কোনও-না-কোনও
স্থানে ফুল ফোটে, অপরূপ জল বয়ে যায়।
মানুষ পশুর রূপ সর্বক্ষণ করে না ধারণ কিছুতেই।
২১.০৫.২০০৫

প্রকৃত বোদ্ধা যদি

কে তুমি এখন এই অবেলায় আমাকে ঘুমের
শান্তি থেকে জাগিয়ে তুলেছ

অন্ধকারে? বেশ কিছুক্ষণ পরে নানা শব্দের
অনুরণে চোখ দু'টি বুজে এলে কে যেন হঠাৎ
আমাকে খুঁচিয়ে তুলে দেয়; চেয়ে দেখি
কেউ নেই, বাতাসের খুব জোর স্পর্শ থাকি।
কিছুক্ষণ ডানে বামে ঘুরে পুনরায় ঘুমোবার
চেষ্টায় প্রলুপ্ত হয়ে চোখের পাতাকে
শান্তি দিতে চেয়ে ব্যর্থ হই। কিছুক্ষণ পরে হাতে
হাল আমলের এক বাক্যগ্রন্থ নিয়ে কেন জানি
ব্যর্থ হই। তবে কি আমাকে পদ্য ত্যাগ
করেছে আখেরে? ঘরে এলোমেলো পায়চারি করি।
আমি কি উন্মদ হয়ে যাব? না হলে এমন হাল
হচ্ছে কেন আমার? কবিতা, অনেকেই
জানেন আমার প্রাণ। যদি সে আমাকে
ছেড়ে যায় ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরের মতো, তবে আমি
ঘরে ও বাইরে ঘুরে বেড়ালেও নিষ্প্রাণ পুতুল
হয়ে থেকে যাব আর বকব প্রলাপ।
এখনও আমার লেখা কবিতা অনেকে,
যতদূর জানি, দিব্যি ভালোবেসে পড়েন এবং
তাদের বিশেষ অপছন্দ হলে ঠিক জানিয়ে ছাড়েন।
প্রকৃতই বোদ্ধা যারা তারা নিন্দা ছুড়ে
দিলে খেদ নেই কোনও, উপরন্তু বেশ কিছু ভেবে
ভবিষ্যতে শুধরে নেয়ার চেষ্টা থেকে হই না বিরত।

প'ড়ে আছি রুক্ষ দ্বীপে

দেখছি আমার পাশ কাটিয়ে একটি লোক লাঠি

হাতে খুব খোঁড়াতে খোঁড়াতে
আমাকে পেছনে ফেলে যেতে চায় যেন। কিছুক্ষণ
পর একজন অন্ধ বৃক্ষতলে শীর্ণ হাত পেতে ব'সে আছে।
তাকে কিছু দেব ভেবে হাতড়াই পকেট; অথচ
পকেট ধূসর মরুভূমি।
মনে-মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে-দিতে
বড় ক্লান্ত বোধ করি। কিয়দ্দূর হেঁটে
গেলে পর চোখে পড়ে গাছের ছায়ায়
কে এক বিচ্ছিরি বিকলাঙ্গ পুরুষ রয়েছে শুয়ে, পাশে তার
একটি মাটির পাত্র। আমি সেই পাত্রে কোনও
কানাকড়ি কিংবা টাকা দিতে ব্যর্থ হয়ে কষ্ট পাই বাস্তবিক।
নিজেকে ধিক্কৃত জীব ভেবে হেঁটে যেতে থাকি পথে।
পথময় কত-না মোটরকার, ঢের চোখ-জুড়োনো দৃশ্যের
মিছিল এবং পাশাপাশি বড় বেশি
কষ্টময় ক্রন্দনের রোল, শৌখিন আসরে
নরনারীদের নৃত্য, কোথাও উল্লাস আর কোথাও মাতম!
ক্লান্তির দংশন মনে হ'ল মৃত্যুপুরী গিলে খাবে।
গা ঝেড়ে দৃষ্টিতে অপরূপ পুষ্পরাজি টেনে আনি
কল্পনার মায়াজালে বুনে। চকিতে কখনও
আমার দু'কাঁধে মখমলি
পাখা গজাতেই দূর মেঘমালায় উড়তে থাকি-
মনে হয় নীল পরী, লাল পরী আমাকে চুম্বনে
ঢেকে দেবে। খানিক পরেই মনে হয়, প'ড়ে আছি রুক্ষ দ্বীপে।

বহুদিন আগে একজন বৃদ্ধ

বহুদিন আগে একজন বৃদ্ধ এক বিকেলের
নম্র অবসরে শোনালেন
আমাকে অজানা এক গল্প যা বানানো নয়
এক রত্তি। কোনওকালে না-শোনা কাহিনী শোনা গেল।
মনোযোগ সহকারে পাতাময় গাছের তলায় কিছুক্ষণ।
স্তব্ধতায় কথকের গাঢ় উচ্চারণ সৃষ্টি করে ভিন্ন প্রভা।
বৃদ্ধ কথকের কথা শুনতে চেয়ে দেখি
আকাশে সূর্যের আলো ঝিমিয়ে এসেছে
আর কয়কটি পাখি গাছের শাখায়
এসে ব'সে নিয়েছে আশ্রয়। বৃদ্ধ তার
সফেদ দাড়িতে হাত বুলিয়ে গল্পের
সূচনা করেই থেমে আকাশের দিকে তাকালেন।
ইতোমধ্যে পার্শ্ববর্তী হ্রদে মৃদু ছলছল ক'রে ওঠে জল
আর বৃদ্ধ কথকের চোখে ভেসে ওঠে
তিনজন যুবতীর অপরূপ সাঁতার এবং কিছুক্ষণ
কেটে গেলে দেখা দেয় অন্য উপসর্গ হয়তো-বা
কেটে গেলে জ্যোৎস্না এই প্রিয় পৃথিবীতে-
মায়ামায় দুনিয়ার যেন আর কোনও জান্নাতের সৃষ্টি করে।
একদিন বৃদ্ধ তার এই প্রিয় শহরের নানা পথ ঘুরে
কেমন বেদনা বোধ করে ধীরে ব'সে পড়লেন
আর চতুর্দিকে নানা মানুষজনের
কাণ্ডকারখানা দেখেটেখে আকাশের দিকে
চেয়ে খুব জোরে হেসে উঠলেন। এই আচরণে
পথচারীদের কেউ-কেউ থামলেন, অনেকেই বাঁকা হেসে দূরগামী। **২৪.০৯.২০০৫**

বাতাসে ভাসবে ঠিক

আমাকে যেতেই হবে দূরে, বহু দূরে।
যদি পা আমার
এখন প্রবল হয়ে যায়, তা হ'লে নিশ্চিত আমার এই
সংসারে বেকার হয়ে থাকব এক কোণে
থাকব সবার কণ্ঠলগ্নপাত্র হয়ে, যা আমার
কস্মিনকালেও নয় বিন্দুমাত্র কাঙ্ঘনীয়,
তখন কি বলতেই হবে আমরাই সব
স্বেচ্ছায় নিয়েছি গ'ড়ে আমাদের বাসনার প্রবল ইচ্ছায়।
বলতে কি হবে কোনও-একটি ঘটনা আমাদের
প্রবল ইচ্ছায় ঘ'টে গেলে
আমাদের প্রতিটি ইচ্ছাই
ঘ'টে যায় সুষ্ঠুভাবে। এমনও তো হয়
পরপর কতিপয় অতিশয় জরুরি কাজের
ছেঁড়াখোঁড়া অবসান ঘটে।
কে তুমি ডাকছ এই ঘোর অন্ধকারে
কামেলা নামের এক রমণীকে? কে সে?
কোথায় নিবাস তার? কী সম্পর্ক সেই
রমণীর সঙ্গে যার নাম ধরে এই অন্ধকারে
বারবার ডাকছ ব্যাকুল সুরে? তাকে
দেখতে না পেলে, বলি আমিও ব্যাকুল হব খুব।
এসো ভাই আমরা দু'জন কণ্ঠ মিলিয়ে ডাকি
পরস্পর, আমরা বাংলার আসমান,
বাতাস ভাসিয়ে দিই। আমাদের দেখা
হোক না-ই হোক, দু'জনের কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসব ঠিক। **১২.১২.২০০৫**

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই

এই যে আপনি আমার বাসার জানালার ভেতর দিয়ে
দৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, কে আপনি? আপনার এই কাজটি কি
তেমন ভালো হচ্ছে? আমার গলার আওয়াজ জানালা থেকে
স'রে গেল। জানালাটি বন্ধ করার সঙ্গেই
একটি বিটকেল আওয়াজ দৌড়ে এসে কোথায়
যেন মিলিয়ে গেল। বাইরের অচেনা ব্যক্তি-
কেউ কি তাকে স'রে যেতে হুকুম দিলেন? কে বলবে?
খানিক পরে কে যেন আমাকে মাথা বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়।
ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই নিজেকে বেজায় কেমন যেন
বেখাপ্পা মনে হল আর আমার পাশেই
একজন তরুণীকে দেখতে পেয়ে ভড়কে গেলাম। তরুণী
মৃদু হেসে আমাকে মধুর সম্বোধন জানালেন। মুহূর্তে
ঘরের পরিবেশ গেল বদলে। তরুণী
উধাও, পাশের শয্যায় একজন বিকট পাণ্ডা দাঁত কেলিয়ে
হাসছে আর ওর মুখ থেকে ঝুলছে কাঁচা মাংস। তার হাসির
তাড়নায় সারা ঘর গমগম করছে, বেজায় কাঁপছে।
খানিক পরে একজন মধ্যবয়সী পুরুষ ট্রে-হাতে
ঘরে ঢুকলেন। তিনি এমন সালাম জানালেন যে, আমার
হাত সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আদাব জানাল। তাঁর ট্রেটিও
ছিল বেশ জমকালো। ট্রের খাবারগুলোও জমকালো। এবং
-খানিক পরেই বেজে উঠল রবীন্দ্রসংগীত। এবং
বেশকিছু পরে হাল আমলের কবির কবিতাও বেজে উঠল
রেকর্ডে। হয়তো সন্ধ্যারাতে কিংবা ভোরবেলা গায়ক
গায়িকা হাজির হবেন এই এলাকার সংগীতপ্রেমীর তৃষ্ণা মেটাতে।

মধ্যরাতে করুণ সুর

আমার চৌদিকে এই সন্ধেবেলা দুরন্ত আগুন
হঠাৎ উঠল জ্ব'লে। কী করে জ্বলল?
কারাই-বা, বলা-কওয়া নেই, সর্বনাশা
ওই খেলা জুড়ল আমার সঙ্গে! ওরা কারা?
আমার তো জানা নেই। যতদুর জানি
কার বাড়া ভাতে ছাই ঢালিনি কখনও।
চারপাশে চোখে পড়ে নানা লোক দ্রুত
নানা ছলে নিজেদের ভাগ্য জ্বলজ্বলে
ক'রে তোলে। অপারগ যারা
সাদাসিধে তারা ড্যাবডেবে চোখে শুধু
চেয়ে থাকে কিংবা বড়জোর ঠোকে
নিজের কপাল। কেঁপে ওঠে হঠাৎ প্যাঁচার ডাকে!
কে তুমি চলেছ একা অন্ধকার-ঘেরা
পথে অতি দ্রুত, যেন তোমার অনুপস্থিতি সেই
স্থানে অনেকের ঢের ক্ষত, কারও কারও
সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুঝি তাই সবাই রয়েছে প্রতীক্ষায়।
হয়তো তোমার পদযুগ ভীষণ নিশ্চল হয়ে এল,
সম্ভবত পৌঁছুনোর আগেই মূর্ছিত হবে তুমি!
এই তো অদূরে অপরূপ আলিশান দালানের
ছায়া যেন যাচ্ছে দেখা বেশ কিছু সবুজ গাছের
অন্তরালে। কারা সেই দালানে করেন বাস সুখে?
সত্যি সুখে? নাকি দুঃখ সুন্দর সুখের
ভাঁজে ব'সে পড়ে দালানের গালিচায়।
ঘন-ঘন মধ্যরাতে করুণ ধ্বনিত হয় সুর!

১৫.১০.২০০৫

মানব-মানবী

যদি কেউ পথে যেতে-যেতে জোরে ঢোল
বাজাতে বাজাতে বলে, ‘শোনো ভাইবোন,
হও সাবধান, আমাদের এ শহরে
নানা স্থানে, এমনকি অলিতে-গলিতে রক্তলোভী
হায়েনারা হঠাৎ পড়েছে ঢুকে,-ভয়
না পেয়ে দাঁড়াও রুখে সামান্য যে-কোনও
অস্ত্র থাকলেও হাতে। যতদূর জানি,
আমাদের দেশবাসীদের অনেকেই দেশপ্রিয়, স্বার্থত্যাগী।
কে না জানে এই দেশের বাশিন্দারা স্বদেশের মান
রক্ষার কারণে হাসিমুখে দিতে পারেন জীবন।
তা হ’লে কী করে শত্রু পারবে ছিনিয়ে নিতে প্রিয়
স্বাধীনতা, তাদের কখনও?
এখন হায়েনাদের ঘোরাঘুরি, লাফালাফি বড়
বেশি চোখে পড়ে,
তা হ’লে একদা যারা স্বাধীনতা এনেছিল
ঝরিয়ে নিজের রক্ত তারা আকাশের
দিকে চেয়ে হাসবে কি কাঁদবে ভেবেই
পাচ্ছে না কিছুতে। রাত এলে হাসে চাঁদ বাঁকা হাসি।
যে যতই হাসাহাসি করুক-না কেন যতকাল
এদেশে থাকবে প্রগতির বুনিয়াদ,
অগ্রসর মানবের জয়গান, ততদিন এখানে বইবে
কল্যাণের স্রোত, গাওয়া হবে স্নিগ্ধ গীত,
ততদিন মানুষের কল্যাণ, প্রণয় থাকবেই।
হয়তো তখন আরও অগ্রসর মানব-মানবী জন্ম নেবে। **২৭.১০.২০০৫**

মুছে যায় অপরূপ মেলা

আচানক মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হ'ল,-
কিছু পদধ্বনি যে প্রবেশ করছে
খুব কাছে। চেয়ে দেখি চারটি রুপালি
কঠোর, নিষ্ঠুর পদযুগ। সেগুলোর অধিকারী
রয়েছে তাকিয়ে এই ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া লোকটির
দিকে, যেন ওরা তাকে এক্ষুনি চিবোবে!
বেশ কিছুক্ষণ ওরা ঘরের ভেতরে দাঁড়ানোর পর এই
সন্ত্রস্ত আমাকে বন্দি ক'রে
নিয়ে চলে ঘরের বাইরে বহুদূরে। হঠাৎ বিকট সেই
চারজন তাদের বন্দিকে গাছে বেঁধে মিশে গেল ধোঁয়াশায়।
আকাশে চাঁদের হাসি জেগে উঠতেই খ'সে যায়
বন্দিদশা আর নানা দিকে ফোটে পুষ্পরাজি।
অকস্মাৎ চোখে পড়ে কতিপয় বিদঘুটে জীব
ভয়নক নখ দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে সকল ফুল আর
বমন ছড়িয়ে দিচ্ছে এদিকে-সেদিকে। কী করে যে
আমার ভেতর এক দূরন্ত বিদ্রোহ জেগে ওঠে
বিদঘুটে জীবদের তাড়াবার- নিজেই বুঝিনি।
চতুর্দিকে অপূর্ব পুষ্পিত ঘ্রাণ আর শোভা জন্ম নেয়।
যাব আর কত দূর, কে আমাকে বলে দেবে
এই কণ্ঠকিত পথে? কোথায় পথের হবে শেষ?
এ-পথের শেষ নেই; যতদিন বেঁচে আছি, পথ
ডেকে যাবে আজ একদিকে, কাল অন্য দিকে আর
নিষ্ঠুর নানা দিক থেকে রংবেরঙের খেলা
দেখিয়ে চকিতে কেড়ে নেয় অপরূপ এক মেলা। **৩০.০৭.২০০৫**

মেঘ থেকে মেঘান্তরে

প’ড়ে যাচ্ছি, প’ড়ে যাচ্ছি, দ্রুত
প’ড়ে যাচ্ছি। প’ড়ে যেতে-যেতে
ভাবছি কেন যে অকস্মাৎ এ-পতন
আমার? করেছি কোন গূঢ় অপরাধ?
কিছুক্ষণ পর দেখি ঝুলছি গাছের
ডালে আর শরীর আমার বড় বেশি
কাঁটাবিদ্ধ। ঝুলতে ঝুলতে ডালে প্রায়
অজ্ঞান হওয়ার পথে কাতরাতে থাকি।
বড় বেশি জনহীন অন্ধকার পথে
প’ড়ে গিয়ে চিৎকার করার চেষ্টায়, মনে নেই
কী হ’ল আমার। বেশ কিছুক্ষণ পর
দেখি এক জীব দ্রুত চাটছে আমার আর্দ্রমুখ।
কিছুক্ষণ পর বহু কষ্টে মুখ পশুর লোভের
গর্ত থেকে ফেরিয়ে সহজ,
বিশুদ্ধ পথের দিকে নিয়ে আসি। ফলে
দুর্গন্ধের জিহ্বার সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।
একটি সফেদ ঢের রূপময় পাখি, ডানা যার
ঢেকে ফ্যালে উৎসুক যাত্রীকে, অকস্মাৎ
আমাকে আরোহীরূপে নিয়ে ওড়ে মেঘ থেকে
মেঘান্তরে, আমি তার প্রসাদের দান করি সানন্দে গ্রহণ।

যদি সে-পাখি বলে যেত

হঠাৎ মধ্যরাতে কেন যে উধাও হল ঘুম,

বুঝতে পারিনি। অনেকক্ষণ জানালার বাইরে
তাকিয়ে অন্ধকার আর গাছের পাতাগুলোর
কাঁপুনি দেখে নিজেকে কেন যেন ভীষণ
অসহায় মনে হল। বুঝিবা জানালায়
রাতজাগা এক পাখি এসে বসল।
পাখিকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকতে দেখে
ভাবলাম সে বুঝি বোবা। অথচ
বেশ পরে ওর বেজায় খড়খড়ে স্বর শুনে নিজের
ভুল গেল ভেঙে। ওর ওই নীরবতা এবং
হঠাৎ প্রায় গর্জে-ওঠা শুনতে পেয়ে খানিক
ভীত হয়ে পড়ি! কে এই পাখি? আমাকে
করবে না তো আক্রমণ? কিছুক্ষণ আবার
চোখ বন্ধ রেখে জানি না কিসের ভরসায় আবার
দৃষ্টি মেলে ধরি। হঠাৎ পাখিটি কী ক'রে যে মধুর
সুরে ডেকে ওঠে, কথা বলে মানবিক ভাষায়-
বিস্ময়ে চমকে উঠে দিখে ওকে। হঠাৎ পাখি
উড়ে চ'লে যায়-জানব না কখনও। শুধু ভাবব!
ভাবছি এতকাল পরে আজও, যদি সে
পাখি বলে যেত আমাকে জীবন আর কাব্যের
নানা সমস্যার সমাধন তা হ'লে খেদ যেত ডুবে
আক্ষেপের শত ঢিল। এখনও হাতে কলম
নিয়ে কী দিনে কী রাতে কাগজে আঁচড় কাটি; জানি না
কখনও সার্থকতা আমাকে চুম্বন করবে কি না।

যুবক ও যুবতীর নিজস্ব ঋতু

ভোরবেলা বাতাসের চুমোয় ঘুমের মাতলামি
কী মধুর ন'ড়ে ওঠে। জানালার বাইরে নজরে
পড়তেই নেচে ওঠে পুষ্পিত গাছের
ডালে দু'টি প্রেমমুগ্ধ পাখির চুম্বন
আমাকে পূর্বের কে প্রভাতের প্রণয়-বিলাস
বড় বেশি আলোড়িত করে। যেন ফের নতুনের স্বাদ পাই।
এই ঋতু যুবক এবং যুবতীর একান্ত নিজস্ব ঋতু-
যদি বলা হয় চতুর্দিক জুড়ে, তবে
বিন্দুমাত্র হবে না সত্যের অপলাপ। তাই আজও
শরতের সৌন্দর্যের মহিমা সর্বদা তারুণ্যের
অন্য নাম। বুঝি তাই বয়স বাড়তে থাকলেও
সতর্ক, নিপুণ যারা বার্ধক্য তাদের কাবু পারে না করতে!
জানা আছে বিলক্ষণ, মানুষের মরণের মুখোমুখি হতে
হবেই, নিস্তার নেই মৃত্যুর করাল অন্ধকার থেকে। তবু
আমরা কি সবাই খেলার ছলে লুপ্ত হতে চাই?
হয়তো এমন কেউ-কেউ আছেন সংসারে যাঁরা
বিলক্ষণ মরণ-পিয়াসী। কিন্তু যে যা-ই বলুক
যৌবন কি বার্ধক্য কখনও পৃথিবীকে ছাড়তে প্রস্তুত নই।

২২-০৯-২০০৫

যেতে-যেতে বড় ক্লান্ত

অনেকটা পথ একা হেঁটে যেতে-যেতে বড় ক্লান্ত
হয়ে যেন ঢ'লে পড়ি বালির লুকানো

মৃত্যুফাঁদে। গা বেয়ে শীতল
ঘর্ম-স্রোত বয়ে যেতে থাকে।
কী করি? কী করি?-প্রশ্ন বারবার
হানা দেয় অন্তরের একান্ত শোণিতে।
এই যে এখানে আমি তোমার দুয়ারে ভোরবেলা,
দুপুর, বিকেল আর সন্ধ্যায়, গভীর
রাত্তিকে ভিখিরি হয়ে পড়ে থাকি একা,
সে শুধু ঝঙ্কৃত কিছু শব্দাবলি কাগজের বুকে
সাজানোর আকাঙ্ক্ষায়। তখন আমার
বুক চিরে রক্তধারা বয় ঢের সকলের অগোচরে।
এখন এখানে ছোট ঘরে এক কোণে ব'সে
সফেদ কাগজে কালো কালির অক্ষর
দিয়ে প্রায়শই পদ্য লিখি-
সংসারে চালের হাঁড়ি শূন্য হয়ে এল
কখন, খেয়াল,-হায় থাকে না প্রায়শ।
অথচ বাগান, নদী, আকাশের তারা চোখে ভাসে!
১৩.১০.২০০৫

শারদ বিকেলে, রাত্তিরে

শারদ বিকেলে মন অকস্মাৎ নেচে ওঠে দূরে
কোথাও জীবনসঙ্গিনীকে
নিয়ে চ'লে যেতে প্রাত্যহিক এলেবেলে
ঝুট-ঝামেলার দাঁত-খিঁচুনি পিছনে ফেলে রেখে।
আমরা সদরঘাটে পৌঁছে মোটামুটি

সুন্দর একটি নৌকো ভাড়া ক'রে ভুলে গিয়ে সব
গ্লানি, অর্থক্ষয়ের দুশ্চিন্তা আর নায়ের নতুন গতি
মুছে দিল শারীরিক গ্লানি আমাদের স্বামী-স্ত্রীর।
প্রকৃতির পবিত্র চুম্বনে এই আকাশের নিচে
জীবনসঙ্গিনী জোহরার চেহারায়, মনে হ'লে,
ফুটেছে স্বর্গীয় আভা, যা আগে দেখিনি বহুদিন।
চিত্রকর হ'লে সে-মুহূর্তে আঁকতাম প্রাণ খুলে তার ছবি।
আকাশে জেগেছে চাঁদ। ভাবি, এই চাঁদ
হাজার বছর ধ'রে জাগে, মানবের দৃষ্টি থেকে
স'রে যায়, আসে আর যায়। তবু তার রূপ
রয়ে যায় চিরদিন। থাকবে কি শেষ তক? এলোমেলো ভাবি
আমার গাঁয়ের প্রায় কাছে এসে পৌঁছে গেছি ভেবে
নৌকোর মাঝিকে ফিরে যেতে বলি। হায়, এতে
জানি না কী ভাবল সে। আমিও যে আচানক
এইমতো সিদ্ধান্ত নিলাম-তাকে আমি বোঝার কী করে?
মনে হ'ল পূর্বপুরুষদের ভিটেবাড়ি ভুলে
বেগানা কোথায় যেন এসে
পড়েছি জ্যোৎস্নার মায়াজালে বড় প্রতারিত হয়ে।
নিজেকে ধিক্কার দিয়ে মাঝিকে তক্ষুনি নৌকা ফেরাতে জানাই।
মাঝি নৌকা ফেরাতেই কারা যেন, মনে হল,
বাঁকা হাসি হেসে ভ'রে দিলো চারদিক।
শুধু আসমানে ক্ষয়ে-যাওয়া বাঁকা চাঁদ
হাসছে কি কাঁদছে কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।

০৩.০৯.২০০৫

শাহ এম এস কিবরিয়ার মৃত্যু নেই

শাহ এম এস কিবরিয়া নামটি যখন
উচ্চারিত হয় এমনকি মৃদুভাবে,
একজন গুণবান মানব জৌলুস নিয়ে
নিমেষে ওঠেন ভেসে দৃষ্টিপথে আজও আমাদের।
শিক্ষার আলোয় তিনি উদ্ভাসিত ছিলেন ব'লেই
মানুষের অগ্রহতি, কল্যাণ-কামনা
ছিল তাঁর ভাবনার প্রধান বিষয়। তাঁকে শাহ
কিবরিয়া ব'লে মনে দিয়েছিল ঠাঁই ভালোবেসে।
অথচ শত্রুর দল হিংসায় উম্মত্ত হয়ে এই
গণহিতকামী পুরুষের গৌরবের
আলোয় হিংসায় সেই পুরুষের জীবননাশের
কূট মতলবে তাঁর বুকে হানল মৃত্যুর ক্রূর ছোপ।
শাহ এম এস কিবরিয়া মুছে যাবেন ভেবেই
যারা তাঁর বুকে হেনেছিল ছোরা কী-যে মূঢ় ওরা।
কেননা ওদের জানা নেই শাহ এম এস কিবরিয়া
যারা, তারা মরে না ছোরা কিংবা অন্য অস্ত্রাঘাতে!

১৯.০১.২০০৬

শেষ চেয়ারের গদি ছেড়ে

যখন প্রথম দেখি সেই স্বল্পভাষী, প্রায়
নিঝুম, নিঃশব্দ, কিছুতেই
বুঝিনি অন্তরে তার উদ্দাম, বিদ্রোহী

যুবক লুকানো ছিল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই-
বয়সে আমার চেয়ে বেশ ছোট হওয়া
সত্ত্বেও ক্রমশ কোনও কোনও ক্ষেত্রে
তাকে আমি শ্রেয় বলে মেনে নিই, যদিও সে হেসে
আমার শ্রেয়তা মেনে নিত
তার পরিচিতদের সকলের কাছে।
মনে পড়ে, বহুদিন আগে সেই যুবা,
শাহাদত চৌধুরী এবং তাঁর এক
জ্বলজ্বলে বিদ্রোহী বান্ধব সন্ধ্যাবেলা
হলেন হাজির এক বিদ্রোহী কাজের মতলব
নিয়ে আর সেই সঙ্গে তাদের কথায় ফুটে ওঠে
অপরূপ ফুলঝুরি। মুগ্ধ হয়ে শুনি আগামীর নবীন দলিল।
শাহাদত চৌধুরী নিজের অন্তরের জ্বলন্ত আগুন
প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে করেছেন
অর্পণ সর্বদা হাসিমুখে। তাঁর দেশপ্রেমের স্বাক্ষর
আমার স্মৃতিকে চিরদিন করতে উজ্জ্বল,
যেমন বিশিষ্ট হাসি তার ভেসে থাকে, যখন কাজের
শেষে চেয়ারের গদি ছেড়ে যেতেন একদা।

সত্তা তাঁর সুর হয়ে যাচ্ছে ভেসে

একদা যখন জ্বলজ্বলে ছিল তাঁর
সত্তা তাঁকে দেখে
লেগেছিল ভালো আর অন্তর্গত আভা
দশজন থেকে স্পষ্ট করেছিল বিশিষ্ট, আলাদা।

কণ্ঠে তাঁর বাংলার মাটি আর নদীর ঢেউয়ের
অপরূপ ধ্বনি জেগে অজস্র শ্রোতাকে
আনন্দিত করেছে এবং আজও জ্যোৎস্নারাতে
অনেকে শুনতে পায় তাঁর গান তৃতীয় প্রহরে।
মোমতাজ আলী খান মৃত্যুর পরেও
কখনও কখনও তাঁর সুর
শহরে ও গ্রামে মানুষের হৃদয়ের
গভীরে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সুদূরে নিয়ে যান।
এখনও নিষ্ঠুর এই কোলাহলময়,স্বার্থপর
কালে মোমতাজ আলী খানের সন্তান
নানা প্রতিকূল বেড়া ডিঙিয়ে পিতার,
গুরুর সাধের মান রাখবে নিশ্চিত।
এইতো গোধূলিলগ্নে দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে-দূরে
দীর্ঘদেহী একজন পুরুষ যাচ্ছেন হেঁটে ধীরে
পেরিয়ে বাঁশের সাঁকো দূরে, বহু দূরে-সত্তা তাঁর
সুর হয়ে যাচ্ছে ভেসে মেঘের অন্তরে।

সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি

এ-গভীর রাতে চুপচাপ আমার শয্যার পাশে
কে তুমি দাঁড়িয়ে আছ? কে তুমি এমন
স্তব্ধতা সত্তায় নিয়ে আমার শোণিত
চুষে নিতে তীক্ষ্ণ শাদা দাঁত
উন্মোচিত ক'রে সেই কবে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছ?
যাও চলে যাও মানবের ডেরা ছেড়ে

অন্য কোনওখানে দূর বিরানায়। এখানে তোমার
ছায়া বিশিক্ষণ পড়লেই অশুভের জন্ম হবে।
কিছুতে নড়ে না সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি, আজ রাতে
ধ্বংসের প্রবল সাধ নিয়ে
এসেছে আমার ঘরে। এখানে পূরণ হলে সাধ
যাবে সে প্রতিটি ঘরে এই শহরের। আমি তাকে
নিশ্চহ্ন করার বাসনায় অস্ত্রাঘাত করি তাকে,
অথচ সে ক্রূর হাসি হেসে আমাকে আঘাত করে খুব জোরে
নিজেই গুঁড়িয়ে প'ড়ে থাকে গৃহস্থের পদতলে। কিয়দ্দূরে
শান্তির প্রশান্ত বাণী মধুর ধ্বনিত হতে থাকে।
২১.১০.২০০৩

হাসে ক্রূর হাসি

ভাবিনি চলার পথে এত বেশি কাঁটা
এবং পাথর বারবার
আমাকে ভোগাবে নানাভাবে। ছেলেবেলা
যখন পিতার আর মাতার মমতা
আমাকে রেখেছে নিত্য ঢের
কষ্ট থেকে মুক্ত, জেগেছেন সারারাত।
বেশ আগে পিতামাতা আমাকে সংসারে
রেখে চ'লে গেছেন ওপারে
জীবনের। সত্য কথা করি উচ্চারণ
আমার নিজের প্রায় শেষ-বেলায়-এখন
বস্তুত তাদের কথা প্রতিক্ষণ মনে পড়ে না কিছুতে

মাঝে-মধ্যে পড়ে আর কখনও-সখনও অশ্রু ঝরে।
নিজেও জনক আমি একজন যার
ছোট এক ছেলে হারিয়েছে প্রাণ জলাশয়ে
সাঁতার জানেনি ব'লে। কখনও-সখনও
মনে হয়, বেজায় করুণ সুরে ডাকে সে আমাকে
ভুলে-থাকা মেঠো-পথে। তখন নিজেকে
বড় বেশি অসহায়, এমনকি কেমন নিষ্ঠুর মনে হয়।
আমার সে-সন্তানের মাকে ভুলেও কখনও তার
ছেলেটির কথা তুলে দুঃখ দিতে চাই না কিছুতে।
কখনও-সখনও কী-যে হয়, সন্তানের
অভিমানী মুখ আজও তাকায় আমার দিকে। আমি
ভীষণ লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলি, চুল
ছিঁড়ি বারবার আর জলাশয় হাসে ক্রূর হাসি!
১৮.১০.২০০৫

হীরা কি স্বর্ণ নেই

দেখছি চৌদিকে থেকে কারা যেন ছুটে
আসছে দুরন্ত লাঠিসোঁটা নিয়ে হাতে
আমাদের বড় বেশি শান্ত,
নিঝুম পাড়ার দিকে। জানি না কী ক্ষতি
করেছি আমরা কোনকালে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত,
ক্ষরু, অস্ত্রবাজদের! অকস্মাৎ মনে হ'ল, কিছু নেই কাছে।
তা হ'লে কি ঘুমঘোরে দেখছিলাম দুঃস্বপ্ন কোনও?
ইদানীং কল্পনায় ডানাময়ী পরী

আসে না দূরের মেঘমালা থেকে এই শ্যামলীর
বেশকিছু বইময় ছোট এক ঘর,
চেয়ার, টেবিল আর বিছানা এবং টেলিফোন
ছাড়া কিছু নেই বটে। তবে দু'- একটি আরও কিছু আছে বটে।
অকুণ্ঠ স্বীকার করি, ছোট এই ঘরটিকে প্রিয়,
বিশ্বাস্ত আশ্রয় ব'লে গ্রহণ করেছি-
বহুদিন হ'ল এর চার দেয়াল, জানালা, মেঝে
যতবার চোখে পড়ে, সত্যি বলি, বুকের ভেতর
কে যেন বাঁশির সুর নিঝুম ছড়াতে থাকে। আর
জ্যোৎস্নারাত পাশের গলিকে, কী আশ্চর্য, বেহেস্তের রূপ দেয়।
আমার হীরা কি স্বর্ণ নেই, নেই কোনও চোখ দু'টি
ধাঁধালো মোটরকার। আছে শুধু একটি কলম,
গুণীজন কখনও সখনও এই লোকটির কলমের
প্রশংসা করেন বটে- তা নিয়ে থাকতে হয় কিছু শুষ্ক খুশি!

২১.০৯.২০০৫

The End

PDF by BDebooks.Com